বরাকে জনবিন্যাসের মূলসূত্র

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়

।। ১ ।।

বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখানে রচিত হয় নি। ব্যক্তিগত প্রয়াসে খণ্ড খণ্ড কিছু আলোচনা হয়েছে মাত্র। কিন্তু বিষয়টির বিপুল বৈচিত্র্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। এই প্রবন্ধে এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত গুহাহিত দিকটির প্রতি আলোকপাতের প্রয়াস আছে।

উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে আসাম নানাদিক দিয়ে একটি বিশিষ্ট ও প্রধান রাজ্য। এরই একটি জেলা ছিল কাছাড়। প্রাচীন গ্রন্থে ও পুরাণে একে হিড়িম্ব রাজ্য বা হৈড়ম্বদেশ বলা হয়েছে। ইতিহাসের প্রবাহে আঞ্চলিক সীমারেখার নানা পরিবর্তন ঘটে, কখনো কখনো নামেরও পরিবর্তন হয়। প্রাক্তন কাছাড় জেলাটি বর্তমানে ত্রিধা বিভক্ত হয়ে কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি নাম নিয়ে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি অবিভক্ত কাছাড় জেলার দু'টি মহকুমা ছিল। এই দুটি মহকুমাই একই সীমারেখা ও আয়তন নিয়ে এখন দুটি জেলা হয়েছে। পূর্বতন কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাটি বর্তমানের কাছাড় জেলা। এই আলোচনায় আমরা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি—এই তিনটি জেলাকে নিয়ে অখণ্ড কাছাড়কেই বুঝিয়েছি, এই অখণ্ড ভূমিভাগ বরাক উপত্যকা নামে সুপরিচিত, তাই একে আমরা সংক্ষেপে বরাক নামেও অভিহিত করি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ সংলগ্ন হয়ে বরাক উপত্যকা প্রধানতঃ বঙ্গভাষী মানুষকেই পালন করেছে, তাই একে আমরা কবিতায় 'ঈশান বাংলা মা' বলেও ডাকি। বাংলাদেশের সুরমা উপত্যকা ও শ্রীহট্টের সম্প্রসারিত ঢল আমাদের বরাক উপত্যকা। তাই এর সামগ্রিক মানবেতিহাসও শ্রীহট্টের সঙ্গে জড়িত। এই অঞ্চলের পূর্বসীমায় মণিপুর, দক্ষিণে মিজোরাম, দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা, উত্তরে বড়াইল পর্বতশ্রেণী ও পশ্চিমে বাংলাদেশ।

কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা মিলে আমাদের আলোচনার 'বরাকের জনবিন্যাসের মূলসূত্র'। ক্ষেত্রটির পরিধি ৬৯২২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে কাছাড় ৩৭৮৬, করিমগঞ্জ ১৮০৯ এবং হাইলাকান্দি ১৩২৭ বর্গ কিলোমিটার। এই ভূমিভাগের লোক সংখ্যা বর্তমানে ২৯৯৪৯৭৭ জন। (কাছাড় ১৪৪৪৯২১, করিমগঞ্জ ১০০৭০৭৮, হাইলাকান্দি ৫৪২৯৭৮) আদমসুমারী — ২০০১. মানচিত্রে আসাম রাজ্যে এর অবস্থান ২৪° থেকে ২৫° বিষুবের উত্তরে অক্ষরেখায় এবং ৯২° ৩৭′ ৪০″ থেকে ৯৩° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। সমগ্র ভূভাগের সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভাষিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এবং সর্বোপরি নৃতাত্ত্বিক পরিকাঠামো একই। এই আলোচনায় মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাহিরের বৈচিত্রের অন্তরালে রয়েছে অলক্ষ্য অন্তশ্চারী কৌম রক্তপ্রবাহ।

ভারতবর্ষে যে ক'টি নৃগোষ্ঠির সাক্ষাৎ পাই তার সবগুলিই বরাকে এসে বাসা বেঁধেছে এবং সকলের ভাষাই এখনো এখানে নিজ নিজ ঐতিহ্য নিয়ে বিদ্যমান তবু রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারনে বাংলা ভাষাই এখানে প্রধান ভাষা, একতম বললেও অত্যুক্তি হবে না, বঙ্গীয় হিন্দু সংস্কৃতিই প্রধান, কৃষিই প্রধান জীবিকা। পাশাপাশি মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পারশি, শিখ প্রভৃতি জাতি ও ধর্মবিন্যাসের জনমণ্ডলী অবস্থিত, বিরোধহীন সৌহার্দে পরস্পরে সম্মিলিত ও অবস্থিত। জনবিন্যাসের ইতিহাসে এই ভূখণ্ডের মত বিচিত্রের মধ্যে এমন ঐক্যবোধ অনত্র দুর্লভ।

সুরমা-বরাক বিধৌত অখণ্ডিত কাছাড়ের কথা খৃষ্টিয় ৭ম ৮ম শতাব্দী থেকেই ইতিহাসে নানাভাবে গুঞ্জরিত হয়েছে। সেই প্রাচীন ইতিহাস থেকেই বর্তমানের দিকে পদপাতে জনবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র এই নিবন্ধে বিধৃত। আমরা যে কালসীমা দিয়েছি, শ্রীহট্টের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে বরাক-কুশিয়ারা বিধৌত কাছাড় ভূমির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব তার চেয়েও প্রাচীন হতে পারে। প্রাচীনতম দিকে খৃষ্টিয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন তাম্রলিপির সূত্র ধ'রে অনায়াসেই যেতে পারি। যদি চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ ধরি তবে বর্তমান কাছাড়ের মণিপুর সীমান্ত ধ'রে একটি পাথের কথা খৃঃ পূঃ ১২৬ অব্দ থেকেই পরিব্রাজকদের জানা ছিল, বলতে হয়।

।। ২ ।।

হিড়িম্বি ও হিড়িম্বার বসবাস বা হিরিম্বা-ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ এবং তাঁর বংশধরগণের আবাসভূমি বা রাজ্যখণ্ড ব'লে কাছাড়কে হৈড়ম্ব নামে পরিচিত করার প্রবণতা একদা প্রবল ছিল। কাছাড় বুরঞ্জীতে ঘটোৎকচের সন্তান কাছাড়ীদের রাজা ছিলেন—একথা বলা হয়েছে। সেইজন্য দেশের নাম হৈড়ম্ব এবং রাজাকে হেড়মবশ্বর বলা হত। কাছাড়ীদের রাজা ছিলেন চচেমফা।

একটি গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, কামরূপরাজ্যের পূর্বে একজন রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁর নাম হিড়ম্ব, রাজার নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় হৈড়ম্ব। মহাভারতীয় আখ্যানের সঙ্গে কাছাড়ের রাজাদের সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপনের প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে এই অঞ্চলে আর্যীকরণের সাথে সাথেই, আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন প্রতিষ্ঠিত হল, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের প্রাধান্য সুনিশ্চিত অটল আসনে স্থির হয়ে স্থিতিলাভ করল, তখন প্রত্যন্তবাসী অন্-আর্য নৃপতিগণের মধ্যে ভারতের সুপ্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের সহিত কোনোক্রমে সম্বন্ধ স্থাপনের একটি উদগ্র বাসনা দেখা দিয়েছিল এবং এ বিষয়ে তাদের ইচ্ছাকে রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন তাদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা। মধ্যপাণ্ডব ভীমসেনের সহিত কাছাড়ীদের সম্বন্ধ এই প্রবণতা থেকে জন্ম নিয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। মহাভারতের বারণাবত দহনের পর পাঞ্জাবদের যাত্রাপথের যে উল্লেখ রয়েছে, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক যে বিবরণ, তাতে ভীমসেনের পক্ষে কাছাড় এসে সেই হিড়িম্বাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী কাহিনীটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের, পূর্ব-প্রান্তীয় রাজ্য কামরূপ অতিক্রম করে প্রান্তভূমি ব্রাত্যভূমি কাছাড়ে ভীমসেনের আগমন উর্বর কল্পনা মাত্র। তবে এখানে একজন রাজা ছিলেন হিড়িম্ব বলে, তাঁর নামে হৈড়ম্ব হয়েছে দেশের নাম, এমনটি হতে পারে এই হিড়িম্বের সহিত মহাভারতের হিড়িম্ব-ভীমসেনের পক্ষে কাছাড় এসে সেই হিড়িম্বাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী কাহিনীটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের, পূর্ব-প্রান্তীয় রাজ্য কামরূপ অতিক্রম করে প্রান্তভূমি ব্রাত্যভূমি কাছাড়ে ভীমসেনের আগমন উর্বর কল্পনা মাত্র। তবে এখানে একজন রাজা ছিলেন হিড়িম্ব বলে, তাঁর নামে হৈড়ম্ব হয়েছে দেশের নাম, এমনটি হতে পারে এই হিড়িম্বের সহিত মহাভারতের হিড়িম্ব-ভীমসেনের কোনো যোগ্য নেই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যঅয় চচেমফারনাম করেছেন পাহাড়ীদের রাজা বলে, চচেম-ফা ঘটোৎকচের পুত্র। এই বংশধারা লোপ পেলে কাছাড়ীদের একজন রাজা হন, জন্ম যার অলৌকিকত্বে ভরা। কিন্তু জন্মসূত্র হিড়িম্ব বংশের সহিত কোনোক্রমে যুক্ত। মহাভারতীয় পৌরাণিক চরিতের সহিত প্রচলিত এই উপকথার কোন যোগ নেই, এ সবই অনুমান, আরোপিত গল্প এবং অন-আর্য নরগোষ্ঠীর আর্য ভাবনারসহিত সংযুক্ত ও একাত্ম হবার প্রেরণার থেকে উদ্ভুত তাদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পুরোহিতদের দ্বারা সুকৌশল উপজাত কল্পকাহিনী। এর অধিক গুরুত্ব এদের নেই। আসামের চুটিয়ারাও (সদিয়া অঞ্চলের) যাঁরার নিজেদের রক্তসূত্রে কাছাড়ীদের সগোত্র মনে করেন, তাঁদের বংশধারার আদিতে শ্রীকৃষ্ণর শ্বশুর মহারাজ ভীষ্মক বর্তমান। কোচ ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও

এই ভাবেই আদিপুরুষ খুঁজেছেন মহাভারতীয় পুরাণে। একটি জাতির জীবনে উন্নততর পৃথক কোনো নৃ- গোষ্ঠির সহিত মিলনের সময় এরূপ প্রবণতা জাগতে পারে, ইংরেজদের বেলায়ও এমনটিই একদা হয়েছিল। কাছাড়ীরা এখানে এসেছে ডিমাপুর ছেড়ে। ডিমাপু থেকে মাইবং, মাইবং থেকে খাসপুর, এর মধ্যে একবার হরিটিকর ও একবার দুধপাতিল তাদের যাত্রাপথে প্রধান্য পেয়েছিল। মাইবং, খাসপুর, হরিটিক্‌র ছিল কাছাড়ী রাজাদের বাসভূমি এবং সেই হেতু এই স্থানগুলি রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। এই সময়টি শক্তি ও ঐশ্বর্যের অবক্ষয়ের যুগ। ডিমাপুরকে কোনো ঐতিহাসিক 'হিড়িম্বপুর' বলে চিহ্নিত করতে চান। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে পূর্বপদ 'হিড়িম্ব' হয়েছে 'ডিম' এবং 'পুর' যথারীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। ভাষাতত্ত্বে এরূপ পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু এমনটি এক্ষেত্রে হয়নি। 'ডিমা-ছা' কাছাড়ীদের ভাষার নাম, এই নৃগোষ্ঠীর যে ব্রহ্মপুত্র ধনসিরি তীর বেয়ে বেয়ে ডিমাপুর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কাছাড়ে, তাতে সন্দেহ নেই। এরা কিরাত বংশোদ্ভব একটি শাখা। এরা আর্যদের কাছে ম্লেচ্ছ, ঠিক যেমনটি ছিল শবর ও পুলিন্দরা। ম্লেচ্ছ থেকে যখন তারা আর্য হতে চাইলেন তখনই হিড়িম্ব-কাহিনী ভীমসেনের সঙ্গে মিশে এই জাতিকে মহাভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কিরাত নরগোষ্ঠীর যে শাখা কাছাড়ে এসে কাছাড়ী হয়েছে, মূলে যারা 'ডিমা-ছা' যাদের ভাষা এখনো 'ডিমা-ছা' নামেই পরিচিত এবং লোক ব্যবহারে কাছাড়ী নামে কখনো কখনো কথিত, তাদেরই একটি প্রশাখা হিন্দু প্রভাবত বোড়োদের এবং প্রবলতর আহোমদের দ্বারা অভিভূত হয়ে, প্রাচীন ঐশ্বর্যের স্মৃতিটুকু নিয়ে, উত্তর-পূর্ব প্রত্যন্ত ভূমিতে 'ডিম-ছা' নর গোষ্ঠীর শেষ চিহ্নরূপে এখনো বিদ্যমান। সদিয়া অঞ্চলে এদের বসবাস। বর্তমান অরুণাচল অতিক্রম করে সুবর্ণশ্রী নদীর ধারা ধরে ডিবাং, ডিহাং-এর তীর বেয়ে এগিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পৌঁছে প্রবল প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত আহোম নরগোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিহত হতে হতে জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে কাছাড়ে এসে কাছাড়ী হয়েছে। এখানে তারা প্রাচীনতম অধিবাসীরা। পথে পথে চিহ্ন রেখে এসেছে এরা। ডুমডুমা, ডিগবয়, ডিব্রুগড়, ডিফু, লামডিং, মাইবং, হাফলং, ডিবাং, ডিহাং প্রভৃতি স্থান ও নদীর নামে কিরাতী কাছাড়ীদের 'ডিমা-ছা' ভাষার স্মৃতি রয়েছে।

।। ৩ ।।

বরাক উপত্যকায় ডিমাছারাই বর্তমানে প্রাচীনতম। তবে এদের পূর্বে প্রব্রাজিত আদি অষ্ট্রলয়েড বা অস্ট্রিক রক্তধারার কথা ভুললে চলবে না। এদের ইতিহাস ধূসর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু সাক্ষ্য এখনো আছে। ষোড়শ শতকের শেষ পদে থেকে ডিমাছারা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এই সময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রায় কাছাড়ী রাজা হৈড়ম্বেশ্বর যশোনারায়ণ। দেবের এবং একটি শিলালিপিতে মেঘনারায়ণ দেবের নাম রয়েছে। উভয়ই গর্ববোধ করেছেন 'হাচেঙ্গসা' বংশাদ্ভব বলে। 'হাচেঙ্গসা' নামে কোনো রাজার ইতিহাস কারো জানা নেই, কেবল নামটি পাওয়া যাচ্ছে এবং আশ্চর্য, এই নামটি নিঃসন্দেহে বোড়ো নাম। বোড়ো নরগোষ্ঠী ভারতীয় কিরাতেরই একটি উপশাখা, যেমন 'ডিমা-ছা' শাখা। লোকায়ত নৃ-গোষ্ঠীতত্ত্বের বিচারে স্বীকার করতে হয়, কোন বড় নৃপতি ডিমা-ছা নৃ গোষ্ঠীতে প্রাধান্য লাভ করে ডিমা-ছা সংস্কার গ্রহণ করেছিলেন অথবা একদা যখন ভারতীয় কিরাতেরা 'বোড়ো' ও 'ডিমা-ছা' উপশাখাদ্বয়ে বিভক্ত হয় নি তখন তাদের দলপতি কেউ ছিল, যার নাম 'হাচেঙ্গসা'। এ সবই জনতত্ত্বের সূত্র ধরে অনুমান সুদুর ইতিহাস-পূর্ব ধূসর কালের ঘটনার। এ দুটির একটিকে স্বীকার না করলে বোড়োদের শব্দ 'হাচেঙ্গসা'র সহিত দিমা-ছা ভাষাভাষী কাছাড়ী রাজা যশোনারায়ণ, মেঘনারায়ণের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করা যায় না। অন-আর্য নর-গোষ্ঠীতে আর্য গোত্রনাম এভাবেই সম্ভব হয়েছে, যেমন কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্র, সাংস্কৃতিক ও রক্তমিশ্রণে। সামাজিক মানুষের চলাচলে এটি একটি অবশ্যাম্ভাবী প্রাকৃতিক ঘটনা।

এস্থলে একটি কথা বলে রাখা ভাল। ইন্দোমঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর তিব্বতীয়-বর্মণ শাখাই বোড়ো, নাগা, কাচিন, ললু, কুকি, মণিপুরী প্রভৃতি ভাষার আদি স্তর। বোড়া দলটি নানা স্তরে উপস্থরে শাখা প্রশাখায় সমস্ত পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত। শাখা-প্রশাখাগুলির নাম বড়ো, পুরাং বা বিপরা, কাছাড়ী, রাভা, মেচ কোচ প্রভৃতি। তিবতীয়-বর্মণের অন্য দুটি শাখা নাগো এবং কুকী বা চীন কা কাচিন। নাগা এবং কুমী-চিন আবার বিভিন্ন উপশাখায় বিভক্ত। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ভারতে বোড়ো মূল ভাষাভাষীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল ১২, ২৮, ৪৫০ জন। কাছাড়ে বড়ো-মূল-জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় ভাষা বাংলা।

'ডিমা-ছা' নরগোষ্ঠীকে কাছাড়ে 'কাছাড়ী' বলে। কাছাড় বা কাছাড় শব্দটির মূল কেউ কেউ খুঁজেছেন সংস্কৃত 'কক্ষ-বাট' শব্দে (কক্ষ-বাট, কচ্ছ-বাট, কাছাড়)। কাছাড়ের অরণ্যভূমি মোটেই শুষ্ক নয়, অতএব প্রত্যন্ত দেশের পথ অর্থ করা যেতে পারে। পরেত্যন্ত দেশবাসীকে ম্লেচ্ছ বা হয়েছে, এখানে ম্লেচ্ছ কিরাতদের বসবাস, সুতরাং কক্ষবাট থেকে 'কাছাড়' হতে পারে। আবার সংস্কৃত কচ্ছ শব্দের একটি অর্থ জলাভূমি বা জলাকীর্ণ দেশ। কচ্ছ থেকে 'কাছাড়' এলে পদান্ত 'ড়' এ ব্যাখ্যা কি হতে পারে? আমাদের মনে হয় 'কচ্ছ-বাট' থেকে কাছাড় হয়েছে (কচ্ছবাট-কাছাআড়-কাছাড়)। এভাবে ভাষাতত্ত্বের নিয়ম দিয়ে দেশের ভূ-প্রকৃতির সহিত মিলিয়ে 'কাছাড়' শব্দটিকে নানাভাবে তৈরী করা যেতে পারে। এত সব অনুমানের পর কেউ যদি আর একটি অনুমান যোগ করেন এবং বলেন 'কাছাড়' একটি দেশী শব্দ এবং এর মূল ভারতীয় মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর কোনো অজানা অনাবিস্কৃত শব্দে নিহিত তবে বলার কিছুই থাকে না। কেবল ভারতীয় আর্য অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলের 'কচ্ছ' প্রদেশের নাম টেনে উত্তর দিতে হয়, যেহেতু আর্যীভবন কচ্ছদেশ—এ পূর্বেই হয়েছে এবং অনেক পরে কাছাড়, তাই 'কচ্ছ' নামটি অপরিচিত ছিল না এবং কাছাড়া শব্দটির গূঢ় মূল 'কচ্ছ-বাট'। এর অধিক অনুমানের বোঝা চড়ানো উচিত হবে না। কাছাড় মানে দাঁড়াবে জলাকীর্ণ ভূভাগের পথ। এখানে প্রধান বা প্রাচীনতম অধিবাসীর 'ডিমা-ছা' গোষ্ঠী, কাছাড়বাসী হয়ে জাতি ও ভাষা নামে কাছাড় শব্দটি গ্রহণ করেছে। বাংলা এদের-ও দ্বিতীয় ভাষা।

।। ৪ ।।

ইন্দো-মঙ্গোয়লেড নরগোষ্ঠীর আরও কয়েকটি শাখার লোকেরা কাছাড়ে বসবাস করেন এদের মধ্যে নাগা-কুকী-মণিপুরী প্রধান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কাছাড়ী, নাগা, কুকী, মণিপুরী জয়ন্তীয়া, লুসাই ও আহোমদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ বিগ্রহ, দলগত নিগ্রত, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, অপহরণ, হত্যা ও বিবিধ উপদ্রপ লেগেই ছিল। এর কিছু কিছু বর্ণনা কাছাড় ইংরেজ অধিকারে এলে তদানীন্তন ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্র ও প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে। এই সমস্ত বর্ণনা থেকে ধারণা করা যেতে পারে, ভ্রমণপথে এরা তখনো সম্পূর্ণ স্থির হয়নি, দলে দলে মাত্র স্থান-নির্বাচন করে বসতি শুরু করেছে এবং এক একটি গোষ্ঠীর প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অধিকার এক একটি ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছে। এদের পাশাপাশি ছিল খাসিয়া ও তিপ্‌রা। খাসিয়ারা অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর তিব্বতীয়-বর্মণ শাখার কোনো এক সময়ের বোড়ো-নাগা কালক্রমে বোড়ো ও নাগা-দুটি পৃথক শাখায় বিভক্ত হয়। এদের মধ্যে নাগারা নানা বিভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের একাধিক উপশাখা কাছাড়ে বিদ্যমান। তাদেরই একটি কাচা-নাগা নামে খ্যাত। বোড়ো থেকে কালক্রমে কাছাড়ী, তিপরা এসেছে। তিব্বতীয়-বর্মণের অন্য একটি দল বর্মা-কুকিচিন। যারা আমাদের কাছে কুকি, বর্মীদের কাছে তারাই চিন।

এই কুকি-চিন থেকে এসেছে কুকি ও মণিপুরী। মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর শ্যাম-চীনীয় শাখা শ্যাম বা থাই উপশাখা থেকে আহোমদের আগমন। কাছাড়ে কিছু গ্রামে আহোম আছে। লুসাই নরগোষ্ঠী শ্যাম-চীনীয় শাখার অন্যতম আর একটি উপশাখা। লুসাইরা কাছাড় ও কাছাড়ের সন্নিকটের

সন্নিকটবর্তী পার্বতী অঞ্চলের অধিবাসী। কাছাড়ে মঙ্গোলয়েড, ভারতীয় সাহিত্যে কিরাত নামে যারা প্রসিদ্ধ, এবং অন্যান্য নরগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রদত্ত ছিল। জনসংখ্যাগুলি ভাষা, জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক গণনা বা সমীক্ষা থেকে তৈরী বলে নৃ-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক হিসেবে এদের সংখ্যায় কিছু হেরফের হতে পারে, তবে প্রদত্ত সংখ্যা থেকে জন-জীবনের সমগ্র-রূপে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অবস্থানগত পরিচিতি একই থাকবে, কম বা বেশী হবে না। 'জাতি' ও 'ভাষা'-নরগোষ্ঠী চিহ্নিত করবার দুটি বৈশিষ্ট্য মৌল উপায়। অবশ্য এর-ও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শারীর-গঠন, নৃ-তাত্ত্বিক বিচার। কাছাড়ের জনবিন্যাসের আলোচনায় এ দিকেও সাধ্যমত দৃষ্টি রেখে এই হিসেব প্রদত্ত।

(ক) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ। কাছাড়ের পার্বত্য অংশে কাছাড়ী, কুকি ও জুলুং মিলে প্রায় ১৪,০০০ এবং নিম্নাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান, মণিপুরী ও নাগা মিলে প্রায় ৫০,০০০. এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানরা ভিন্ন নরগোষ্ঠী ভুক্ত, কাছাড়ে শ্রীহট্টের পথ দিয়ে আগত। এই পথ বেয়ে এক সহস্রাধিক খ্রীষ্টীয় অব্দ থেকেই বঙ্গীয়-হিন্দু সংস্কৃতি ধর্ম ও পুরাণ এবং ভাষার এই অঞ্চলে চলাচল ঘটেছিল। লোকসংখ্যার হিসাবটি নির্দ্বিধায় গ্রহণ যোগ্য নয়,যে সরকারী পত্র থেকে এই সংখ্যা উদ্ধৃত সেখানেও এ-বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষাই আলোচ্য কালে কাছাড়ের মূল ভাষা।

(খ) ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ

কাছাড়ের জনসংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। তবে কোন নরগোষ্ঠী কতজন সে কথা বলা হয় নি। ভাষা-ও পৃথকভাবে চিহ্নিত হয় নি।

(গ) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ

কাছাড়ে জনসংখ্যা কাছাড়ী, কুকি ও নাগা বাদ দিয়ে প্রায় এক লক্ষ। কাছাড়ী, কুকি ও নাগার সংখ্যা আনুমানিক পনেরো থেকে কুড়ি হাজার। কুকি ও অন্য পার্বত্য নরগোষ্ঠীর কোন কোন উপদলের কিছু কিছু লোকেরা এখনো ভ্রাম্যমান, বাকী সবাই কাছাড়ে এতদিনে স্থিতিলাভ করেছে। মূলভাষা বাংলা, ভিন্নভাষাভাষীকের পারস্পরিক আদান প্রদান ও লোক ব্যবহারের ভাষা ও বাংলা।

।। ৫ ।।

এর পর দীর্ঘদিনের ব্যবধান। এক শত বছর পরে যখন কাছাড়ের জনবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করি তখন বাংলা-হিন্দী-ওড়িয়া জনগোষ্ঠী এসেছে, যারা আর্য-অনার্যের 'টানা-পড়িয়ানে' রক্তমিশ্রণে গঠিত। এখানের মুণ্ডারি, খাসিয়া, সাঁওতালী এসেছে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর কোল-মুণ্ডা উপশাখা থেকে। মার এসেছে মন-খ্‌মের বলে অস্ট্রিক শাখারই অপর একটি উপস্তর ভেঙ্গে। বাউরী বা রী এসেছে, যারা ব্রাত্য, উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর-মানভূম বর্দ্ধমান ছেড়ে চা বাগানের টানে। এই টানেই এসেছে কিছু সংখ্যক মূল দ্রাবিড়-ভাষী, অনুরূপে এবং ব্যবসার সূত্রে কিছু নেপালী। আশ্চর্যের বিষয়, গানপত্যাধর্মী মহারাষ্ট্রীয় মূল ভাষান্তরিক মানুষও কাছাড়ে রয়েছেন, যেমন রয়েছে বঙ্গীয় জনধারা খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকেই মণিপুরে। এরা ষোড়শ শতাব্দী থেকে কাছাড়ী নৃপতিদেরও পৃষ্ঠপোষতা লাভ করে। কাছাড়ী রাজাদের সংস্কৃত ও বাংলা শিলালিপি ও মুদ্রা এর প্রমাণ। হিন্দী আসে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ও পরে চা-বাগিচার শ্রমিকদের মাধ্যমে। ওড়িয়াও এসেছে চা-বাগানের শ্রমিক মারফত্ উনিশ শতকের শেষ দিকে। জীবিকাশ্রয়ী তেলেগুর আগমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময়। এরা দ্রাবিড়-ধারায় অন্তর্ভুক্ত। কাছাড়ে সদ্যগত ইতিহাসের সময়, আবার চা-বাগানের পত্তন ও সম্প্রসারণের সময় এবং শেষ বার দেশ বিভাগের পর। দ্রাবিড়-মূল প্রথম ধারাটি এসেছিল রাজসভার সূত্র ধরে, জয়ন্তীয়া রাজদরবারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় ধারাটি এসেছে চা-পত্তনীর পর।

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের চলাচল ঘটেছে প্রধানত তিনটি কারণে। অজন্মা, অনাবৃষ্টি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে মানুষ দেশান্তরী হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্য বা জীবিকার সন্ধান। তৃতীয় কারণটি রাজনৈতিক — দেশজয়, যুদ্ধ দেশবিভাগ, রাজনৈতিক সীমা পরিবর্তন, নির্বাসন প্রভৃতি। কাছাড়ে জন-বসতি গড়ে উঠার গত দু'শ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ সব কারণ-গুলিই এখানে কাজ করেছে। আর ইতিহাসে দেখব, এখানে রাজ্য-পত্তনের প্রথম প্রয়াস কোচদের, তারপর তিপ্‌রাদের, এরপর কাছাড়ীরা, এবং সর্বশেষে হাত বাড়িয়েছিল মণিপুরী, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রজাদের আমন্ত্রণে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা কাছাড়ের শাসনভাব গ্রহণ কর। এরপর থেকেই পটপরিবর্তনের সূচনা হয়, কাছাড়ের নূতন প্রচ্ছদ তৈরী হয়।

।। ৬ ।।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি ভারতীয়-আর্য, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-যে তিনটি মূল জনধারা ভারতের জনমণ্ডল রচনা করেছে কাছাড়ে তারা বিদ্যমান। এছাড়া এদের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত কিরাত রক্তধারা প্রবাহিত জাতিগুলি - নানারূপে, নানাদলেও নানা ভাষা-গোষ্ঠীতে। এদেরই কীর্তিধারা ছোটনাগপুর পেরিয়ে মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। ভোট-চীনীয় ধারার মণিপুরী জনগোষ্ঠীও কাছাড়ে বিদ্যমান। এরা এসেছে প্রথমে রাজকীয় সূত্র ধ'রে, পরে অন্যান্য কারণে। প্রকৃত-পক্ষে এখানে এদের গুরুত্ব হৈড়ম্ব রাজ্যাধিকারের সময় থেকে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই আলোচনায় হিন্দু অর্থে ভারতীয় হিন্দুয়ানী ও ভাষা, যা আর্য-অনার্য মিশ্রণজাত বুঝতে হবে এবং অন্যান্য নরগোষ্ঠীর মধ্যেও হয় ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশ্রণ বা একই নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে রক্ত মিশ্রণ ধরতে হবে। বর্তমানে প্রতিটি সমাজেই মানসিক ও জৈবিক প্রেরণা, শিক্ষার আলোক, কর্মক্ষেত্রে মেলামেশা, সামাজিক বিধি-নিষেধ ও রীতি-নীতির শৈথিল্য এবং অর্থনৈতিক কারণে নানা-ভাবে পৃথক পৃথক নরগোষ্ঠীর রক্তমিশ্রণের অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। ফলে কাছাড়ে যে চারটি নরগোষ্ঠী ও তাদের শাখা-প্রশাখার অবস্থিতি আলোচিত হয়েছে তাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু মিশ্রণ ঘটেছে, এই রক্ত মিশ্রণ চলবেই। এই সব বিচিত্র নরগোষ্ঠীর যে স্বাক্ষর এখানো কাছাড়ে বিদ্যমান তার বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রয়োজন।

।। ৭ ।।

ভারতে নৃতাত্ত্বিকেরা যে কয়টি নরগোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন কাছাড় আমাদের দেশে একমাত্র জেলা যেখানে তার সব কটিই এসে বাসা বেঁধেছে, এবং তাদের পরিচয়পত্রে এখনো প্রাচীন বংশ চিহ্ন বিদ্যমান। মহাভারতের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন কাছাড় তারই প্রতিধ্বনি তুলে বলতে পারে—

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে

তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।''

—ভারততীর্থ। রবীন্দ্রনাথ

নৃতত্ত্বের গবেষক-অধ্যাপকের নিকট কাছাড় একটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যয়ন' ক্ষেত্রে। একে আমরা ভারতের 'Anthropological garden' আখ্যা দিতে পারি।

।। ৮ ।।

নরগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা বাহিরেই দৃশ্য এবং সকলের বোধগম্য, নৃতত্ত্বের গভীর ও সূক্ষ্ম বিচার এবং দেহ গঠনের বৈচিত্র্য বাদ দিয়েও যা অনুধাবনীয় এবং নরগোষ্ঠীর লোপ পেলেও যার আভাস ইঙ্গিত তার পরিত্যক্ত জীবনাচরণের ভগ্ন উপকরণাদিতে সহজেই লভ্য। বরাকের পথে পথে নরগোষ্ঠীর চলাচলের এরূপ চিহ্নগুলি বিচার করে দেখলে এখানে তাদের আগমনের, বসতিস্থাপনের আনুমানিক কাল বের করা অসম্ভব হবে না। এই উপত্যকার বঙ্গ-ভাষাভাষীরা ভাষায় নবীন আর্যের এবং সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীর ধারা অনুসরণ করছেন। কিন্তু রক্তধারায় এরা আর্য নন, অন্-আর্যও নন, এ-দুয়ের টানাপড়েনে রচিত একটি মিশ্র জাতি। বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলমান সবার পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। কোথাও আর্য-অস্ট্রিক, কোথাও আর্য-মঙ্গোল, কোথাও আর্য-মঙ্গোল-অস্ট্রিক—এমনি সব বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে এখানে। শুদ্ধ আর্য পূর্বভারতে বহুদিনই হয়ে গেল লোপ পেয়েছে। এই আলোচনায় আর্য বলতে সেইটুকু আর্য বুঝতে হবে, বাঙ্গালীর মধ্যে যেটুকু আর্য-ভাব রয়েছে। মূল কথা, বরাকে আর্যী-সংস্কৃতিকরণ বাঙ্গালীর দান, পঞ্চনদতীরবাসী বা মধ্য ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকাবাসী বেদ বেদান্ত পুরাণের আর্যের নয়। তবে রক্তধারা এমন একটি ব্যাপার যার ফল বা স্ফূরণ মিশ্রণের বহু শত পরেও হঠাৎ দেখা দিতে পারে। এখানে হিন্দু-মুসলমানর দীর্ঘ মুখাবয়ব, সুদৃঢ় সুগঠিত উন্নত নাসিকা, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ কিন্তু গোলের দিকে ঝোঁক- - - এমন মানুষ দেখা যায়। এরা কি নৃতত্ত্বে যারা নর্ডিক তাদোর ধারাই বইছে? এদের গায়ের রঙ রক্তিম-শ্বেত, তবে জল বায়ুর প্রভাবে কিছুটা ম্লান বা বাদামী অথবা কালচে হতে পারে। কোনো মুসলমান পারিবারে এরূপ দেহগঠন দেখা যাবে। হিন্দুরা কথা পূর্বেই বলেছি, এরা একটি মিশ্র জাতি যা তৈরী হয়েছে অস্ট্রিক বা কোলিড মেনালিড, অ্যালপাইন বা পূর্ব ব্রাকিডের মিশ্রণে। বরাকে এদের সঙ্গে মিশেছে প্রচুর মঙ্গোলীয় রক্ত, ফলে বর্তমানে যারা তপশীলী জাতি, জনজাতি বা অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী নামে চিহ্নিত তাদের উদ্ভব। তপশীলী ও জনজাতির সংখ্যা ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে হিসাবে ১,৭৮,৮৬৭+১৫২৮৩ আসাম রাজ্যে। কাছাড়েই তপশীলীদের সংখ্যা সর্বাধিক। কিন্তু অভিভবে মগ্ন মঙ্গোলয়েড জাতির মধ্যে শিবের প্রভাব রয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই শৈবভাবটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পট্টিকেরা রাজ-বংশের, যাঁদের মূল মঙ্গোলয়েড নরধারা, মুদ্রায় বৃষ ও ত্রিশূল চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। কাছাড়ে শিব এসেছেন এই সময় বা এরও কিছু আগে। কপিলাশ্রমে সিদ্ধেশ্বর শিব এবং ভুবনতীর্থে শিবের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে মঙ্গোলয়েড স্মৃতি বিজড়িত। এ-দুটি ছাড়া কাছাড়ে যত্র তত্র শিববাড়ী দেখা যাবে। মঙ্গোলয়েড জাতির আগমনেরও আগে এখানে যে কিছু কিছু অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করত তাতে সন্দেহ নেই। এই অস্ট্রিক-চেতনাসম্ভুত সংস্কৃতিই ত্রিপুরার উনকোটিতে রয়েছে, কাছাড়ের ভুবন পাহাড়েও রয়েছে। দেহহীন মস্তকের চিত্র ও স্মৃতির মধ্যে দেবতার সন্ধানের আদিম প্রয়াস অস্ট্রিক বৈশিষ্ট্য; কুণ্ডের মধ্যে উর্বরা শক্তির পূজা থেকে মাতৃ-তন্ত্র চেতনাও অস্ট্রিক-বোধ সঞ্জাত। ভুবনতীর্থে এ দুটিই বর্তমান। পরবর্তীকালে এখানের শিব প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং শক্তি-তন্ত্র তার পাশেই রয়েছে। কাছাড়ে 'মুড়া' পদবীর লোকেদের মধ্যে 'চুরকিন' বা 'ছুরকিন'—একটি শব্দ প্রচলিত, এটি কেবল শব্দ নয়, একটি বিশিষ্ট অস্ট্রিক তন্ত্রের দ্যোতক। বিহাড়া অঞ্চলে গাণপত্য ধর্মের বৃত্তিভুক্ত হিন্দু পরিবার রয়েছেন, যাদের ভূমি-পত্তনীতে গণপতির দেবোত্তরতা প্রতিষ্ঠিত। গোত্র ও সংস্কৃতিতে পুরুলিয়া জেলার গদিবেড়োর আচারিয়াদের মতই সাত্ত্বিকতার আভাস এদের আসে। শিলচরের নিকটে কাশীপুর চা বাগানে নায়ার উপাধিধারী পরিবারে দক্ষিণী সাংস্কৃতিক চিহ্ন এখনো নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবাহিত হয়। এটি দ্রাবিড় ধারার পরিচয়। এই সব নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন পথ ধ'রে কাছাড়ে এসে বসতি গ'ড়েছে। এদের আগমনের এই সব বিচিত্র ঐতিহাসিক কথামালা আমরা এখন ভুলতে বসেছি।

।। ৯ ।।

এইসব গোষ্ঠীর গমনাগমনের প্রাচীনতম পথের সন্ধানও পাওয়া গেছে। একটি পথ তিব্বতের পর্বতমালা পার হয়ে সদিয়া অঞ্চল থেকে নেমে এসেছে ডিমাপুর এবং সেখান থেকে লামডিং হয়ে শিলচর। লামডিং-শিলচর পথটি নতুন করে তৈরী হচ্ছে।

দক্ষিণ চীন, তিব্বত ও ব্রহ্মের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের আরো কয়েকটি প্রাচীন স্থলপথের সন্ধান মিলেছে। এইসব পথ গুলিই স্পর্শ করেছে কাছাড়ের ভুগোল। কয়ুয়ান-চেয়াঙের প্রায় সাতশত বৎসর আগে একজন চৈনিক রাজদূত চাঙ্‌কিয়েন (খ্রীঃ পূঃ ১২৬) একটি পথের কথা বলেছেন। এই পথটি দক্ষিন চীন থেকে উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুর পার হয়ে কাছাড়ের ভিতর দিয়েই কামরূপে প্রবেশ করেছিল এবং ক্রমশঃ তির্যকভাবে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে পাহাড়ের কোল ধরে উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি অতিক্রম করে শেষে একেবারে আফগানিস্থানে উপনীত হত। কিয়া-তান (৭৮৫-৮০৫ খ্রীঃ) নামে অন্য একজন চীনা ভ্রমণকারী টঙ্কিন (দক্ষিণ চীন) শহর থেকে কামরূপ পর্যন্ত একটি পথের কথা বলেছেন, অনুমান হয় এই পথটিও কর্কট-ক্রান্তির উত্তরে সমান্তরালভাবে মণিপুর কাছাড় হয়ে পশ্চমাভিমুখে গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের (বাংলা দেশ) পরাক্রান্ত পট্টিকের রাজবংশের সহিত ব্রহ্মদেশের পাগান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ময়নামতী থেকে শ্রীহট্ট শিলচরের নিকট দিয়েই লুসাই পাহাড় ও মণিপুর অতিক্রম করে উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করে মধ্য-ব্রহ্মের পাগান পর্যন্ত একটি অতি পরিচিত পথ বিদ্যমান ছিল। মণিপুর-ব্রহ্ম যুদ্ধের এবং ব্রহ্ম-মণিপুর কাছাড় যুদ্ধের সৈন্য সামন্ত এই দিয়ে চলাচল করত। এই সমস্ত পথগুলি দীর্ঘদিনের পরিচিত বাণিজ্য পথও, যে পথ দিয়ে অন্তর্দেশ ও বহির্দেশের সহিত কাছাড়ের সংযোগ রক্ষিত হয়ে এসেছে। এই পথগুলিই ছিল কাছাড়ে সমাগত নর-গোষ্ঠীর চলাচল পথ। এরই পাশে পাশে ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীকেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ছোট ছোট উপপথ। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, বরাক উপত্যকা এখন মূল ভারত ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হলেও অতীতে এমনটি ছিল না। পূর্ববঙ্গ দিয়ে যে পথই মণিপুর, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্ভোজ, দক্ষিণ চীন প্রভৃতির দিকে গিয়েছিল তার প্রায় সবগুলিই এই অঞ্চল স্পর্শ করেছিল অথবা উপপথে কাছাড়ের সহিত সংযুক্ত ছিল। আর থেকে প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা গোবিন্দকেশব দেবের ভাটেরা লিপির ভট্টপাটক সিলেট-কুলাউড়া রেলপথের পার্শ্বস্থিত ভাটেরা গ্রাম। ভট্টপাটক নামের একটি রেলষ্টেশনও রয়েছে। এ থেকেই লিপির নাম ভাটেরা লিপি। এই লিপিতে অন্ততঃ আঠাশটি গ্রামের নাম আছে, প্রায় অবিকৃত ভাবেই এখনো যারা বর্তমান। ভাটেরার ভিতর দিয়ে প্রাচীন যে পথ ছিল, সেই পথ ধরেই রেলপথ বসানো হয়েছে এবং পথটি কাছাড় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দীতে একবার বর্তমান কাছাড় জেলার কিছু অংশে বঙ্গীয় জানপদ-শাসন যে বিস্তৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই শাসন সূত্র এখানে বঙ্গীয় সমাজের আগমন সহজ করে তুলেছিল। যে আঠাশটি গ্রামের কথা বলা হয়েছে তার অনেকগুলিই যেমন ইটাখলা, পাঁচগ্রাম চেংকুড়ি আমাদের পরিচিত।

।। ১০ ।।

নিবন্ধটিতে ভিন্নতর প্রেক্ষিত গ্রহণের পূর্বে একটি বিষয় সংক্ষেপ বলা প্রয়োজন। পূর্বে দু' এক জায়গায় বলা হয়েছে, মঙ্গোলয়েড জাতিই কাছাড়ের আদিম নরগোষ্ঠী, তার মানে এই নয় যে, এদের আগে কোন নৃ-গোষ্ঠী এখানে ছিল না। এখানে অস্ট্রিকরা ছিল, তাদের বিস্তৃতিও কিছু কিছু ঘটেছিল কিন্তু কোন অজানা কারণে অতি সামান্য চিহ্ন মাত্র রেখে তারা এই অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এরূপ সময়ই এসেছে মঙ্গোলয়েডরা। অস্ট্রিকদের সহিত এদের কোন সংঘর্ষ ঘটেনি, অন্ততঃ তেমন কোনো চিহ্ন এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তদবধি মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীই এখানেই মূল নৃ-ধারারূপে বিরাজ করেছে। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যশোনারায়ণ যখন মাইবাং এসেছিলেন, তার বহু বহু পূর্বে থেকেই ডিমা-ছা নরগোষ্ঠী এই ভূ-খণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এখানে বসবাসকারী মঙ্গোলয়েডদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলতে হয়। এখানে যে বিপুল পরিমাণ তপশীলজাতি, জনজাতি অনুন্নত শ্রেণীর সাক্ষাৎ মেলে তাদের অধিকাংশই সদ্যনির্মোক-মুক্ত মঙ্গোলয়েড বা মিশ্র-লোক-উপজাতি।

বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর কাছাড়ে আগমনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে ভুবন পাহাড়ে অবস্থিত শিবতীর্থটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার একটি কৌতুহলোদ্দীপক সামগ্রী। এখানে আপাতদৃষ্টিতেই অস্ট্রিক দ্রাবিড় তিব্বতীয়-মঙ্গোল এবং ভারতীয়-আর্য জনগোষ্ঠীর ক্রমান্বয় আগমনের প্রত্ন-ইতিহাস পাওয়া যায়; তবে জন সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও মিশ্রণে প্রত্ন চিহ্নগুলি ক্রম-বিলীয়মান।

এই হচ্ছে কাছাড়ের জনবিন্যাসে রক্তধারা-প্রবহণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

।। ১১ ।।

এখন আমরা অবিভক্ত কাছাড়ের জনবিন্যাসকে ভিন্নতার প্রেক্ষিতে উপস্থিত করব। এই হিসাবগুলি থেকে বর্তমানে এখানের জন চরিত্রের পরিচয় মিলবে।

(ক) কাছাড়ের বর্তমান মোট আয়তন ৬,৯২২ বর্গ কিলোমিটার, এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৪৬ জনের বাস। এখানের১৯৭১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনাযায়ী জনসংখ্যার হিসাবটি নিম্নরূপ,——

মোট জনসংখ্যা, ১৭,১৩,৩১৮; এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮,৯১,১২৬ এবং নারী ৮,২৯,১৯২ জন। এদের মধ্যে শহরে বাস করেন মাত্র ১,৩৫,৬৯১ জন, বাকী সবাই গ্রামে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এখানে জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি হিসাব প্রদত্ত হল, জনসংখ্যা হাজারে এবং বৃদ্ধির হার প্রতি দশ বছরে দেখানো হয়েছে।

খৃষ্টাব্দ	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	গ্রাম	শহর	বৃদ্ধির হার
১৯০১	৬৩০	৩২৬	৩০৪	৬১৫	১৫	- - - -
১৯১১	৭১৩	৩৭১	৩৪২	৬৯৬	১৭	১৩.২১
১৯২১	৭৫২	৩৯২	৩৬০	৭৩৫	১৭	৫.৩২
১৯৩১	৮০৩	৪২২	৩৮১	৭৮২	২১	৬.৯৪
১৯৪১	৮৯৫	৪৭২	৪২৩	৮৬৮	২৭	১১.৩৮
১৯৫১	১,১১৬	৫৮৮	৫২৮	১,০৫৫	৬১	২৪.৬৬
১৯৬১	১,৩৭৮	৭২২	৬৫৬	১,২৮১	৯৭	২৩.৫৩
১৯৭১	১,৭১৩	৮৯১	৮২২	১,৫৭৭	১৩৬	২৪.২৯

(খ) ভারতের প্রায় সব-কটি ধর্ম সম্প্রদায়ই কিছু না কিছু এখানে রয়েছে, কিন্তু বরাক কোনো ধর্ম সম্প্রদায়েরই গর্ভগৃহ নয়। এখানের ধর্ম-ভিত্তিক জনবিন্যাস ও তার সঙ্গে জীবিকার বিষয়টি অধ্যয়ন করলে জানা যাবে, এখানের উপরিতলে ভাসমান কিছু জনগোষ্ঠীর মূল এখানের মাটিতে গভীরে এখনো প্রবেশ করে নি, - - শিখ সম্প্রদায়ের কথা এই সূত্রে আসে, আসে জৈনদের কথাও। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির মতো এরা এখানের মাটিতে, জল হাওয়ায় মিশে যাননি। বিবাহাদি সংস্কারে এরা এখনো তাদের মূল উৎস ভূমির দিকেই চেয়ে থাকেন।

ধর্ম ভিত্তিক হিসাবটি নিম্নরূপ—

ধর্ম	১৯৫১ খৃঃ	১৯৬১ খৃঃ	১৯৬১ খৃঃ	১৯৭১ খৃঃ
হিন্দু	৬,৭৬,৬৪০	৮,২১,৬০০	১০,০৩,৯৯৫	
মুসলমান	৪,২৯,৪৫৭	৫,৩৯,৪৫৭	৬,৮৩,৩৮৭	
খৃষ্টান	৮,৪২২	১৫,১৭৮	২২,৬৮৬	
শিখ	১৪	৩৯	১৪১	
বৌদ্ধ	৭০	৩১১	৩০৮	
জৈন	১৩৬	৪৩৭	৮০	
অন্যান্য	১১৭	৮৩৯	১	

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের লোকগননায় ৫৬০ জনের ধর্ম অনুল্লিখিত ছিল। জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের লক্ষণীয় বৃদ্ধির কারণ তাদের উপজীবিকা। ব্যবসায় সূত্রে তাদের আগমন। প্রথমে অস্থায়ী এবংপরে বাসস্থান নির্মাণ।

ভারতের চারটি মূল ভাষাবংশের কথা আমরা পূর্বে বলেছি এরা ভারতীয়-আর্য্য, দ্রাবিড়, ভোটচীনা বা কিরাত অস্ট্রীক বা নিষাদ। চারটি ভাষাবংশই শাখাপ্রশাখা নিয়ে কাছাড়ে রয়েছে।

গ্রীয়ার্সনের গ্রন্থে (১৯০৩-১৯২৮) ভারতে ভাষার সংখ্যা ১৭৯ এবং উপভাষার সংখ্যা ৫৪৪ ধরা হয়েছে।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনার একটি সমীক্ষা, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে সমীক্ষাটি রচিত থেকে জানতে পারি, ভারতে মাতৃভাষা রয়েছে ১৬৫২টি, এর মধ্যে ৫৩০টি কোনো গোষ্ঠীভুক্ত নয়, ১০৩টি ভাষা অভারতীয়। মাতৃভাষা বলে চিহ্নিত ভাষা সংখ্যায় কিছু অতিরঞ্জন রয়েছে বলে মনে হয়, কারণ জাতি বাচক উপাধিও অনেক স্থলে লোকগণনা পত্রে ভাষা নামে নথিভুক্ত হয়েছে। সে যাই হোক, মোট কথা এই যে ভারতবর্ষ ভাষা-অরণ্যের দেশ এবং তারই একটি প্রতিচ্ছবি কাছাড়ে দেখতে পাই।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনার সূত্র ধরে (অ) ভারতে মূল চারটি ভাষাবংশের জনসংখ্যা এবং (আ) কাছাড়ে ও তাদের সংখ্যা নীচে প্রদত্ত হল।

অ, ভারতে চারটি ভাষা বংশের জন সংখ্যা,

বংশের নাম	বংশ অন্তর্ভুক্ত	মোট জনসংখ্যা মাতৃভাষার সংখ্যা
ভারতীয়-আর্য	৫৭৪	৩২,১৭,২০,৭৬০
দ্রাবিড়	৫৩	১০,৭৪,১০,৮২০
ভোট-চীনা	২২৬	৩১,৮৩,৮০১
অস্ট্রিক	৬৫	৬১,৯২,৪৯৩

আ. বরাক উপত্যকায় এই চারটি ভাষা বংশের জনসংখ্যা

বংশের নাম	বংশ অন্তর্ভুক্ত	মোট জনসংখ্যা মাতৃভাষার সংখ্যা
ভারতীয়-আর্য	১৮	১২,৩৮,৫৪১
দ্রাবিড়	৬	- - -
ভোট-চীনা	১৯	১,০০,৪৪৭
অস্ট্রিক	৯	৮,৮৫১
অন্যান্য	- - -	১৫,০০৫
এবং বিষ্ণুপ্রিয়া	১৫,৫৮২	

অন্যান্য ব'লে চিহ্নিত জনসংখ্যার মধ্যে দ্রাবিড় রয়েছে, বিষ্ণুপ্রিয়া পৃথক ভাবে চিহ্নিত হলেও এটি ভারতীয় আর্য্য বংশের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিভিন্ন ভাষাবংশের যে মাতৃভাষাগুলি কাছাড়ে প্রচলিত তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

১। ভারতীয় আর্য। বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, নেপালী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারোয়াড়ী, বা রাজস্থানী ভোজপুরী, পাঞ্জাবী, (গুরুমুখী) বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি।

২। দ্রাবিড় তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, গোণ্ড, খোন্দ, ওরাং প্রভৃতি

৩। ভোট চীনা মণিপুরী বা মেইতেই, নাগা, কাবুই, আবর, লুসাই, বা মিজো, ডিমাছা, (কাছাড়ী, হৈড়ম্ব), গারো, কুকি, মেচ, বর্ম, তিপরা, রিয়াং প্রভৃতি

৪। অস্ট্রিক মুণ্ডারী, সাঁওতালী, কোল, খাসি, শবর, মার, ভিল, কুরতি, মাঝি প্রভৃতি।

৫। অভারতীয় ভাষা ইংরাজী, ফরাসী, স্কটিশ, ওয়েলস, চীনা, কাবুলী, বা পুস্ত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি।

৬। মিশ্রভাষা ভারতীয় আর্যের মিশ্রণজাত উর্দু, দ্রাবিড় মিশ্রণজাত গোয়ানিচ্জ, ভোট-চীনা মিশণজাত সিনতাই, সিতাই, রালতি, মহালী, পান, লালুং, প্রভৃতি। এদের ভাষার সঠিক অধ্যয়ণ এখনো হয় নি। এরা ছোট ছোট দলে পুঞ্জী বা গ্রামে